বাংলা বানানের সংস্কার
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে বাংলা আকাদেমি
অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

বাংলা বানানের সংস্কার প্রক্রিয়া অনেকদিন ধরেই চলছে। বাংলা বইপত্র পুথির যুগ থেকে মুদ্রণের যুগে উত্তীর্ণ হল উনিশ শতকের গোড়ায়। বাংলা বই ছাপার কাজ শুরু হয় মিশনারিদের হাতে। তার কিছু কাল আগে ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড-এর 'A grammar of the Bengal Language' যা রচিত হয়েছিল 'ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং'। এই বই-এ বাংলা পুথি থেকে বেশ কিছু উদ্ধৃতি আছে। সেইসব উদ্ধৃতিতে যেসব বানান পাওয়া যায় তার কিছু নমুনা হল :

রজনি মহিপাল নবিন গভির পক্ষি রথি নিচ পরাধিন দ্বিতিয়া
পাখি হিরা নদিয়া কান্ডারি জমিদারি কিস্তিবন্দি রুপ দুর পুর্ণ অপরুপ
ঋন গন গুন মনি প্রান দ্রোন রন ক্ষন বর্ন কর্ম্ম গমন বরন দ্বিগুন দর্পন করুনা গনেশ রাবন কারন মরন হরিন শ্রাবন ব্রাহ্মন ব্রাহ্মনী রক্ষন অরন্য সম্পূর্ণ নিবারন বিশেষন পুন্যবান প্রনিপাত রামায়ন বিচক্ষন নিমন্ত্রন
রানী মহারানী ততক্ষণ পরগনে
জে জাই জাব জায় জত জেন জোড়া জখন জতক জেমতে জুবতী
সঙ্কা সত সিঘ্র ক্রোস সয়ন বিনাস সিখর অবস্য মহাসয় পসুপতি অস্ব সুন সুনি সুনায় সুনিয়া সুনিলে সুনিলাম সুইয়া সান্তিপুর সান্তিপুরী সান্তিপুরিনী

উপরের উদাহরণ থেকে দেখা যাবে অতৎসম শব্দে যেমন ব্যাপকভাবে হ্রস্ব ই-কার, হ্রস্ব উ-কার, দন্ত্য ন, বর্গীয় জ এবং দন্ত্য স ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি সংস্কৃত শব্দও নির্বিচারে ওই নিয়মে লেখা হয়েছে। এ কথা ঠিক, লিপিকর বা লিখকগণ তেমন শিক্ষিত ছিলেন না বলে বানানে শুদ্ধতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। হ্যালহেডের ওই বই-এ তাই এরকম বানানও পাওয়া যায়—মহত্ত সান্তনা সন্যাসী বিক্ষাত ধনুদ্ধর অন্তধ্যান পরম্পর স্বহায় দুশ্বাসন আকাষ ভূবন সারথী। কিন্তু ওইসব বানান থেকে বাঙালির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য এবং বর্ণযোজনার প্রবণতটা সহজেই ধরতে পারা যায়।

অথচ উনিশ শতকের গোড়ায় মিশনারিরা যখন সংস্কৃত পন্ডিতদের সহায়তায় 'সাধু' ভাষা গড়ে তুলতে তৎপর হলেন তখন ওই স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে বিচ্ছেদ ঘটে গেল। বাংলা বানানকে সংস্কৃতায়িত করার জন্য তাঁরা কোমর বেঁধেছিলেন। এর ফলে যে গোড়ায় গলদ হয়ে গেল তা রবীন্দ্রনাথ এইভাবে দেখিয়েছেন:

'নিজের জিনিস নিজের নিজের নিয়মেই ব্যবহার করিতে হয়। পরের জিনিস নিজের নিয়মে খাটাইতে গেলেই গোল বাধিয়া যায়। যে সংস্কৃত শব্দ বাংলা হইয়া যায় নাই, তাহা সংস্কৃতেই আছে। যাহা বাংলা হইয়া গেছে, তাহা বাংলাই হইয়াছে— এই সহজ কথাটা মনে রাখা শক্ত নহে।

কিন্তু কেতাবের বাংলায় প্রতিদিন ইহার ব্যতিক্রম হইতেছে। আমরা জড়-এর জ এবং যখন -এর য একই রকম উচ্চারণ করি, আলাদারকম লিখি। উপায় নাই। শিশু বাংলা গদ্যের ধাত্রী ছিলেন যাঁরা, তাঁহারা এই কান্ড করিয়া রাখিয়াছেন। সাবেক কালে যখন শব্দটাকে বর্গ্য জ দিয়া লেখা চলিত - ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতরা সংস্কৃতের যৎ শব্দের অনুরোধে বর্গ্য জ- কে অন্তঃস্থ য করিয়া লইলেন। অথচ ক্ষণ শব্দের মূর্ধন্য ণ-কে বাংলায় দন্ত্য ন-ই রাখিয়া দিলেন। তাহাতে, এই যখন শব্দটা একাঙ্গীভূত হরগৌরীর মতোই হইল; তাহা—

আধভালে শুদ্ধ অন্তঃস্থ সাজে
আধভালে বঙ্গ বর্গীয় রাজে।'

এ কথারই যেন প্রতিধ্বনি পাই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ODBL গ্রন্থে যেখানে তিনি বলেছেন, 'Literary Bengali of prose, during the greater part the 19th century was thus a doubly artificial language; and with its forms belonging to middle Bengali, and its vocabulary highly Sankritised, it could only be com-pared to a modern English' with a Chaucerian grammar and a super- Johnsonian vocabulary, The literary form for prose became the standard, and growth of the printing press established the grammar and the orthography ` the latter, the work of Sanskritists ignorant of the history, and phonetic tendencies of the language, threw overborad the meagre traditions of spelling for the tadbhava words that obtained in Middle Bengali.'

এইভাবে আদি সংস্কার প্রক্রিয়ার মধ্যেই একটা টানাপোড়েনের জমি তৈরি হয়েছিল। একদিকে সংস্কৃতের আত্ততা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা, অন্যদিকে সংস্কৃতের অনুশাসন মেনে চলার তাগিদ। বাংলাভাষার উদ্ভবের সময় তার শব্দের সঞ্চয়ে তৎসমের ভাগ অনেকটাই ছিল, আবার সেই সঙ্গেই ছিল অর্ধতৎসম, তদ্ভব ও দেশি - বিদেশি নানা শব্দ। তৎসম শব্দগুলি চেহারায় সংস্কৃত, যদিও উচ্চারণে মোটেও মূলানুগ নয়। তৎসম শব্দে প্রযোজ্য সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম আর সব শব্দে কতখানি চালানো যেতে পারবে তা নিয়ে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে। বানান সংস্কারের কথা ওঠে মূলত এই জায়গাটাতেই। আবার বানান সংস্কারের সঙ্গে বর্ণ বা হরফ সংস্কারের প্রশ্নটা জড়িত।

শ্রীরামপুর মিশন থেকে উইলিয়ম কেরির তত্ত্বাবধানে বাংলা বই প্রকাশিত হতে থাকে। কেরি পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁকে বাংলা বানানের নীতি নির্ধারণ করতে হয়েছিল। তিনি বাংলা অভিধানও সংকলন করেছেন। কেরি যেমন সংস্কৃত শব্দের বিশুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখেছেন তেমনি অতৎসম শব্দাবলির বানানকে সংস্কৃতের অনুগত করারও উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

বাংলা ভাষার নিজস্ব চরিত্রটা ধরবার চেষ্টা প্রথম দেখা যায় রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' -এ। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত ওই গ্রন্থে তিনি বলেছিলেন, ঋ ও দীর্ঘ ঋ এবং ঌ (লি) ও দীর্ঘ (ঌ) স্বরের কোনো ব্যবহার গৌড়ীয় ভাষায় নেই। ওগুলি সংস্কৃত শব্দ লেখার সময় লাগে। তিনি লক্ষ্য করেছেন বাংলায় মূর্ধন্য ণ-এর উচ্চারণ আসলে দন্ত্য ন -এর সদৃশ এমনকি তালব্য শ যে বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে দন্ত্য স- এর মতো উচ্চারিত হয়ে থাকে একথাটাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ বার হয় ১লা বৈশাখ ১২৬২ অর্থাৎ এপ্রিল ১৮৫৫ । আর দ্বিতীয় ভাগ বেরিয়েছিল

জুন ১৮৫৫ -তে। প্রথম ভাগের ৬০তম সংস্করণ প্রকাশ পায় ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে। বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা বর্ণমালার সংস্কার সাধিত হল। এতদিন পর্যন্ত বাংলা বর্ণমালায় ছিল ষোলো স্বর আর চৌত্রিশ ব্যঞ্জন : অ আ ই উ ঊ ঋ ঋৃ ৯ ৯৯ এ ঐ ও ঔ অং অঃ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ। বিদ্যাসাগর বাংলা স্বরবর্ণ থেকে দীর্ঘ ঋ আর দীর্ঘ ৯ এই দুই অনাবশ্যক বর্ণকে বর্জন করলেন। অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হতে পারে না বলে ওই দুটি ব্যঞ্জনবর্ণে স্থানান্তরিত করলেন। চন্দ্রবিন্দু (ঁ) - কে স্বতন্ত্র একটি ব্যঞ্জনবর্ণ বলে গ্রহণ করলেন। বর্ণমালার শেষ অক্ষর ক্ষ যেহেতু ক ও ষ মিলে যুক্তব্যঞ্জন তাই সেটিকে অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকা থেকে তুলে দিলেন। আবার ড় ঢ় য় এই তিনটিকে স্বতন্ত্র বর্ণের মর্যাদা দিয়ে বর্ণমালায় অন্তর্ভুক্ত করলেন। পরে 'ৎ' বা খন্ড তকারকেও অনুরূপ মর্যাদা দিয়েছিলেন। এইভাবে ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা তাঁর বাংলা প্রথমপাঠ পুস্তিকার মধ্যে একভাবে বাংলা সংস্কার করে এক অতি প্রয়োজনীয় সুদূরপ্রসারী কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। সেদিনকার প্রথম পড়ুয়া এবং গুরুমশায় ও পূর্ব - শিক্ষিতদের নিশ্চয় কিছুটা অসুবিধার অধ্যে পড়তে হয়েছিল প্রচলিত পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করে বিদ্যাসাগরকৃত পরিমার্জনায় মানিয়ে নিতে।

এরপর ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় উত্তরপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিবন্ধ 'Bengali Spoken and Written' প্রকাশিত হয়। বাংলা বানান নিয়ে গভীরভাবে বিচারবিবেচনার সূত্রপাত এই নিবন্ধটি থেকেই—এ কথা ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য হল রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালব্যাপী শব্দতত্ত্বচর্চার সূচনাও ওই সময়ের কাছাকাছি। বাংলা ভাষার নিজস্ব চলা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের অবহিত করেছেন তাঁর লেখা শব্দতত্ত্বের নানা নিবন্ধে এবং 'বাংলাভাষা - পরিচয়' গ্রন্থ। বাংলা বানান নিয়ে তাঁর মতামত যে বানান সংস্কার প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই সময় ১২৮৫ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তিন কিস্তিতে প্রকাশিত হয় একটি দীর্ঘ নিবন্ধ যার শিরোনাম 'বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার'। নিবন্ধ লেখকের নাম ছাপা হয়নি। এই নিবন্ধে অনেকগুলি বিষয় নিয়ে বিচার - বিশ্লেষণ করা হয়। বাংলা বর্ণমালার জায়গায় রোমান হরফের বিষয়টি আলোচনা করে লেখক সিদ্ধান্তে আসেন যে, প্রচলিত বর্ণমালাকে সংস্কার করে নিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারবে। তিনি প্রস্তাব করেন স্বরবর্ণের রূপ হোক এরকম— অ আ অি অী অু অূ অৃ অে অৈ অো অৌ। ব্যঞ্জনবর্ণ - ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ ং ঃ ঁ। সংযুক্ত বর্ণ ভেঙে লেখা (যেমন, বুদ্‌ধি) কথাও তিনি বলেন। বর্গের পঞ্চাশ বর্ণের জায়গায় বিন্দু বসানোর (যেমন অ°গ অ°চল স°ধা) কথাও ভেবে দেখাতে বলেছিলেন। তিনি আরও বলেন— 'রফলা যুক্তবর্ণ যে দ্বিত্ব করিয়া লেখা হয় যে কেবল সংস্কৃতের নিয়মানুসারে; সংস্কৃতেও তাদৃশ দ্বিবিধির নিত্যতা নাই। যাহা হৌক ভাষায় ওরূপ দ্বিত্ব না লিখিয়া যদি একটি বর্ণের উপর রেফ দিয়া লেখা হয় অর্থাৎ 'কর্ম্ম' যদি 'কর্ম' এইরূপে লেখা হয় তাহা হইলে কিছুই হানি নাই।' এই নিবন্ধ টি সম্বন্ধে বিশেষ করে বলার কথা এই যে বিগত একশো বছরের উপর ওইসব প্রস্তাব ঘুরে ফিরে অনেকবার উত্থাপিত হয়েছে, এবং কেউ কেউ সেগুলি তাঁদের মৌলিক ভাবনা বলেও দাবি করেছেন। বাংলা ভাষার জন্য রোমান হরফ ব্যবহার না করাটাই যথোচিত সিন্ধান্ত বলেই শেষ পর্যন্ত সকল স্তরের মানুষ মেনে নিয়েছেন। সুনীতিকুমার হেন ভাষাবিজ্ঞানী এক সময় রোমান হরফের পক্ষে সওয়াল করলেও পরবর্তীকালে সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছিলেন। রাজনীতিকার অনেকে এ দেশের বহুভাষিকতার কথা ভেবে রোমান হরফের প্রবক্তা হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরাও সে প্রস্তাব কার্যকর করতে পারেননি। নিজের ভাষার বিশিষ্টহরফ বা বর্ণলিপির প্রতি সেই ভাষাভাষী মানুষের দরদ ও মমত্বকে অগ্রাহ্য করা যায় না। ওই নিবন্ধ কারের অন্যান্য প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয়নি। তবে সমগ্র নিবন্ধ টি অবশ্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নিবন্ধটির রচয়িতা কে হতে পারেন তা নিয়ে কোনো গবেষণা হয়নি। রচনাটির মধ্যে লেখকের সংস্কৃত প্রাকৃত ও ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানের গভীরতা, মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান এবং সর্বোপরি এলায়িত অথচ সরস লিখনভঙ্গি থেকে অনুমান করতে ইচ্ছে করে যে রচয়িতা হলেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পর নানা কাগজপত্রের মধ্যে একটি বাঁধানো খাতায় তাঁর নিজের হাতের লেখায় সংকলিত বাংলা শব্দের একটি তালিকা পাওয়া যায়। তালিকাটি ১৩০৮ বঙ্গাব্দে (১৯০৮ খ্রি.) সাহিত্য - পরিষৎ - পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ওই তালিকায় সাত হাজারের কিছু বেশি শব্দ আছে। বিদ্যাসাগর কেন এই শব্দ সংকলন করেছিলেন তা জানবার উপায় নেই। তিনি কোথাও এ সম্বন্ধে কিছু লিখে যাননি। তবে এটিকে প্রচলিত অতৎসম শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত বানান অভিধান বলা যেতে পারে। সংকলিত শব্দাবলি অনুধাবন করলে অতৎসম শব্দের বানান সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মনোভাব জানতে সাহায্য করবে। বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত ওই তালিকায় এইসব বানানের শব্দ দেখতে পাওয়া যায় : বাড়ি গাড়ি গাভি পাখি তির চিন চিনা বাঙালি ফরাসি কাহিনি সরকারি ঘরনি মাসি পিসি ননদি শাশুড়ি ডাক্তারি রঙিন পালকি জে যখন পরগনা ঠাকুরানি। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী কিংবা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের যেসব সংস্কার করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তারই পূর্বসূরি হলেন বিদ্যাসাগর। শুধু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিদ্যাসাগরের ওই শব্দ - সংগ্রহ নিয়ে বিশেষ আলোচনা এযাবৎ হয়নি।

বিশ শতকের গোড়া থেকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বাংলা বানান আর ব্যাকরণ নিয়ে মাঝে মাঝেই আলোচনা বার হতে থাকে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠার পর বাংলায় বিদ্বজ্জন এ নিয়ে চিন্তাভাবনায় আত্মনিয়োগ করেন। বেশ কিছু গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সবুজ পত্র' মাসিক পত্রিকা। চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনার ব্যাপারে এই পত্রিকার ভূমিকা সর্বজনবিদিত। এর আগেও চলিত ভাষায় ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও কাহিনি লেখা হয়েছে। কিন্তু এই পত্রিকাকে অবলম্বন করে একটি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন নেতৃত্ব। সাহিত্যে চলিত ভাষা ব্যবহারের কারণে অতৎসম শব্দ, বিশেষত তদ্ভব, অনেক বেশি বেশি প্রয়োগ হতে লাগল। ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের হ্রস্বরূপ চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য। এই অবস্থায় কোন্ শব্দ কী বানানে লিখতে হবে তা নিয়ে নানা সংশয়ের সৃষ্টি হয় এবং একই শব্দ দুই বা ততোধিক বানানে লেখা হতে দেখা যায়। তখন তরুণ ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ওই পত্রিকার জন্য একটি বানানরীতি তৈরি করে দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়।

এরপর রবীন্দ্রনাথের 'সমস্ত বাংলা লেখার একটা Standard spelling করার' উদ্দেশ্যে কবির নির্দেশমতো প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বসেছিলেন সুনীতিকুমারের সঙ্গে। সেটা ১৯২৪ -এর সেপ্টেম্বর। এরই বছর খানেক বাদে ১৯২৫-এর নভেম্বর (অগ্রহায়ণ ১৩৩২) 'প্রবাসী' পত্রে প্রকাশিত হয় প্রশান্তচন্দ্র মহলাবিশের 'চ'লতি ভাষার বানান' নামে প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের প্রস্তাবনায় বলা হয়—বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনার জন্য 'একটি খসড়া বানান - পদ্ধতি খাড়া করা হয়েছিল' এবং সেই কাজের 'প্রধান কর্ত্তা' হলেন সুনীতিবাবু। আরও জানানো হয় 'রবীন্দ্রনাথ নিজে সাধারণভাবে এই পদ্ধতিটি অনুমোদন করে দিয়েছিলেন।' ওই প্রবন্ধের প্রস্তাবনায় এই তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যটি ছিল : 'এই পদ্ধতির মধ্যে খানিকটা অংশ অবশ্য পরীক্ষা করে দেখা দরকার। পরীক্ষাধীন জিনিসগুলি চলে কি না দেখে আবার পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করতে হবে। বাঙলা ভাষার বানানকে একেবারে বেঁধে দেবার সময় এখনও আসেনি। আরো কিছু

দিন নানা রকম পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন আছে।

প্রশান্তচন্দ্র সংকলিত এই বানান পদ্ধতিতে লুপ্তচিহ্ন আর হসন্তের আধিক্য ছিল এবং ক্রিয়াপদে ছিল ও-কারের বাহুল্য (যেমন, ব'ললো ব'লছো ব'লবো আছো ছিলো দিতো)। উচ্চারণ - অনুগ বানান লেখার দিকে ঝোঁক ছিল। ঔ - কারের বদলে অউ লিখতে চাওয়া হয় (বউ মউ)। অন্ত্য বিসর্গ সাধারণভাবে বর্জনের কথা বলা হয় (আপাতত বিশেষত), তবে যেখানে বিসর্গ উচ্চারিত হয় সেখানে তা রক্ষা করার (নমোনমঃ) নিয়মও ছিল। কি আর কী-র পার্থক্য নির্দেশ করা হয় এই নিয়মে। বলা হয়, প্রশ্নসূচক অব্যয়ে 'কি' আর নির্দেশক সর্বনামে 'কী' বানান হবে। এছাড়া অ্যা ধ্বনির জন্য আলাদা অক্ষর উদ্ভাবনের প্রস্তাবও ছিল। আদ্য অ্যাকারের ক্ষেত্রে আঁকড়ি - যুক্ত এ-কার বা মধ্যে ে-কার ব্যবহার (দ্যাখো ফ্যালো -র জায়গায় দেখ ফেল) করার কথা বলা হয়। এই সংকেত রবীন্দ্রনাথই বলে দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়।

বিশ্বভারতী এভাবে একটা রাস্তা খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতেও বানানে সমতা পুরোপুরি আসে না। তিরিশের দশকের গোড়ায় প্রকাশিত হয় রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' অভিধান। চলিত ভাষার বানান নির্ণয়ের জন্য ভাষা ব্যবহারকারীরা প্রধানত এই অভিধানেরই শরণ নিতে লাগলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাংলা বানানের নিয়ম প্রস্তুত করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। সেই অনুসারে উপাচার্য ১৯৩৫ -এর নভেম্বরে একটি বানান সমিতি গঠন করে তাদের উপর নিয়মাবলি রচনার ভার দেন। সেই সমিতির সভাপতি করা হয় রাজশেখর বসুকে। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ। প্রায় দুশো জন বিশিষ্টলেখক ও অধ্যাপকের অভিমত আলোচনা করে এই সমিতি বানানের নিয়ম সংকলন করেন। 'বাংলা বানানের নিয়ম' শীর্ষক পুস্তিকার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ৮ মে ১৯৩৬। তার ভূমিকায় বলা হয় : 'সমিতিতে ভার দেওয়া হয়—যে সকল বানানের মধ্যে ঐক্য নাই সে সকল যথাসম্ভব নির্দিষ্টকরা এবং যদি বাধা না থাকে তবে কোন কোন স্থলে প্রচলিত বানান সংস্কার করা। ...বিভিন্ন পক্ষের যুক্তি - বিচারের পর সদস্যগণের মধ্যে যতটা মতৈক্য ঘটিয়াছে তদনুসারেই বানানের প্রত্যেক বিধি রচিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে যে নিয়মাবলী সংকলিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া হয়তো কেহ কেহ মনে করিবেন— বানানের যথেষ্ট সংস্কার হয় নাই, কেহ-বা ভাবিবেন — প্রচলিত রীতিতে অযথা হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। বানান - নির্ধারণের প্রথম চেষ্টায় এইরূপ মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ...যদি সাধারণে সংকলিত নিয়মাবলী গ্রহণ করেন তবেই অনেক বাংলা শব্দের বিভিন্ন রূপ অপসৃত হইবে এবং তাহার ফলে বাংলা ভাষাশিক্ষার পথ কিছু সুগম হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকাদিতে ভবিষ্যতে এই নিয়মাবলী - সম্মত বানান গৃহীত হইবে। আবশ্যক হইলে ইহা সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হইতে পারিবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২ অক্টোবর ১৯৩৬। তার ভূমিকায় লেখা হয় ÷ 'এই পুস্তিকার প্রথম প্রচারের পর বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকগণের নিকট হইতে যে অভিমত পাওয়া গিয়াছে তাহা বিচার করিয়া বানান - সংস্কার সমিতি কয়েকটি নিয়মের কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন। এই সংস্করণে সংশোধিত নিয়মাবলী দেওয়া হইল।' এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরে বিজাপিত হয়, 'বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাহা পালন করিতে সম্মত আছি।'

২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭ 'ক্যালকাটা গেজেট' -এ শিক্ষা বিভাগের একটি ঘোষণা প্রচারিত হয় যার মর্ম হল বিদ্যালয়পাঠ্য সকল পুস্তকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত নিয়মাবলি যথাসম্ভব অনসৃত হবে। এই ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর একটি গোষ্ঠী বিরোধিতা ও প্রতিবাদে মেতে উঠলেন। তাঁরা সম্মিলিত স্বাক্ষরে সংবাদপত্রে চিঠি পাঠান। সেই চিঠিতে লেখা হয়: '...বানানের আমূল পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে সেগুলি বাঙ্গালা বানানের প্রচলিত পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। ...আমাদের মতে বানানের প্রচলিত পদ্ধতির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধনের চেষ্টা করা অনুচিত। ...এজন্য আমরা বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন পূর্ব্বোক্ত ঘোষণা প্রত্যাহার করেন। এই কুপরামর্শ প্রসূত হঠকারিতা পরিচায়ক প্রস্তাবগুলি যাহাতে পরিত্যক্ত হয় এবং বাংলা ভাষায় একান্ত অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছনীয় একটা গোলযোগ সৃষ্টির পথ যাহাতে বন্ধ হয়, অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস - চ্যান্সেলারকেও অনুরোধ করিতেছি।' এই চিঠির স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন দেবপ্রসাদ ঘোষ, সজনীকান্ত দাস, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, রাধাবিনোদ পাল, অশোকনাথ শাস্ত্রী, অনাথগোপাল সেন, খগেন্দ্রনাথ সেন, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র প্রমুখ। এঁরা কেউ সাহিত্যিক, কেউ অধ্যাপক, কেউ পত্রিকা সম্পাদক।

২১ এপ্রিল ১৯৩৭ আনন্দবাজার পত্রিকায় আর একখানি চিঠি প্রকাশিত হয়। বানান সমিতির অনুকূলে লেখা সেটির লেখক বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁর পূর্ণ বয়ান এরকম:

'কয়েকজন বন্ধুর কাছে শুনিলাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নাকি বাংলা বানানে বিপ্লব আনিবার চেষ্টা করিতেছেন,শুনিয়া দুর্ভাবনা হইল, সুতরাং খোঁজ লইলাম ব্যাপারটা কি। বাংলা বানানের প্রস্তাবিত নিয়মাবলীর তৃতীয় সংস্করণের খসড়া পড়িলাম, কিন্তু আপত্তিজনক কিছুই নজরে পড়িল না। বাংলা ভাষার প্রকৃতি অনুসারেই নিয়ম রচিত হইযাছে, বানানে কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা হইয়াছে, মাত্র দুই এক স্থলে সরলতর বানান বিহিত হইয়াছে। যেমন রেফের পর দ্বিত্ব বর্জ্জন। ব্যাকরণের নিয়ম ভঙ্গ হয় নাই। প্রচলিত অভ্যাসেও বিশেষ আঘাত দেওয়া হয় নাই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টার সমর্থন করিয়াছেন। নিয়ম রচনার ভার যাঁহাদের উপর দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের দায়িত্বজ্ঞান আছে, বিদ্যারও অভাব নাই। তাঁহাদের প্রস্তাব এতই সংযত ও সহজ যে নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই তাহার অনুমোহন করিবেন।

সকলেরই মনঃপূত হয় এমন নিয়ম রচনা অসম্ভব এবং অভ্যস্ত রীতির সামান্য পরিবর্ত্তনেও প্রথম প্রথম কিছু বাধিতে পারে। কিন্তু এই কারণেই যদি গতানুগতিক পন্থা ধরিয়া থাকিতে হয় তবে উন্নতি অসম্ভব। আমর বিশ্বাস বানানের প্রস্তাবিত নিয়মগুলি ভালই হইয়াছে এবং তাহাতে ছাত্র শিক্ষক লেখক সকলেরই উপকার হইবে।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গৃহীত 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০ মে ১৯৩৭। সেখানে উপাচার্যের ভূমিকায় জানানো হয় : 'এই পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের পর আরও কয়েকটি অভিমত পাওয়া গিয়াছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য - সম্মিলনের অধিবেশনে বাংলা বানান - সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। এবং সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথও কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে তাঁহার মত জানাইয়াছেন। এই সকল অভিমত বিচার করিয়া নিয়মাবলীর সংশোধন করা হইল।' এই সঙ্গে আরও বলা হয়: 'ছাত্রগণের নূতন বানানে অভ্যস্ত হইতে সময় লাগিবে। প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর পুরাতন বানান লিখিলেও চলিবে।'

বানানের নিয়মসমূহ সূত্রাকারে গ্রথিত করার আগে প্রবেশক অংশে বলা হয়েছিল— 'সমস্ত বাংলা শব্দের বানান এককালে

নিয়নন্ত্রিত করা সম্ভবপর নয়। নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে বাঞ্ছনীয়। ...কেবল নিয়ম রচনা দ্বারা সমস্ত বাংলা শব্দের বানান নির্দেশ অসম্ভব। নির্ধারিত বানান অনুসারে একটি শব্দতালিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।...অভ্যস্ত রীতির পরিবর্তনে অল্পাধিক সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু কেবল সেই কারণে নিশ্চেষ্ট থাকিলে কোনও বিষয়েরই সংস্কার সাধ্য হইবে না।...'

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বানানের বাইশটি নিয়ম বেঁধে দেওয়া হল। সেই নিয়মগুলি নীচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল ÷

১। তৎসম ও অতৎসম শব্দের রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না (অর্চনা মূর্ছা অর্ধ বার্ধক্য কার্য কর্জ শর্ত সর্দার)।

২। পরপদের গোড়ায় ক খ গ ঘ থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ম্-এর জায়গায় অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্ বিধেয় (অহংকার / অহঙ্কার, সংগীত/ সঙ্গীত, সংঘ/ সঙ্ঘ।

৩। অতৎসম শব্দের শেষে সাধারণ হস্ চিহ্ন দেওয়া হবে না (ওস্তাদ জজ তছনছ আর্ট)

৪। মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকলে তদ্ভব বা সে ধরনের শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হবে (কুমীর/কুমির, পাখী/ পাখি, ঊনিশ / উনিশ, পূর্ব পুব)।

তবে স্ত্রীবাচক এবং জাতি ব্যক্তি ভাষা ও বিশেষণবাচক শব্দের শেষে ঈ হবে (কলুনী কেরানী ইংরেজী রেশমী)। কিন্তু 'ঝি দিদি মাসি পিসি মাঝারি চলতি' লেখা চলবে। আবার মনুষ্যেতর জীব, বস্তু , গুণ, ভাব ও কর্মবাচক শব্দের এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল ই হবে (বেঁজি কাঠি কেরামতি পাগলামি তাড়াতাড়ি)

বিদেশি মূল শব্দের উচ্চারণের যদি ঈ ঊ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ ঊ বিধেয় (ঈস্ট = east, স্পূল =spool)।

৫। কাজ জাউ জাঁত জুঁই জো জোত জোরাল প্রভৃতি শব্দে জ লেখা বিধেয়।

৬। অসংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য ণ হবে না (কান সোনা কোরান)। কিন্তু যুক্তাক্ষরে ন্ট ণ্ঠ ন্ড ন্ঢ চলবে (ঘুন্টি লন্ঠন টান্ডা)। রানী-র বিকল্পে রাণী লেখা যেতে পারে।

৭। সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ বা অর্থভেদ বোঝাবার জন্য ও-কার বা ঊর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জনীয়। অর্থগ্রহণে বাধা হলে অন্ত্য অক্ষরে ও -কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্বকমা বিকল্পে দেওয়া যেতে পারে (কাল/কালো, মাত/মতো, ভাল/ ভালো, পড়ো/ প'ড়ো)। এসব বানান বিধেয়— এতে তত তো হয়তো।

৮। বাঙ্গালা/ বাংলা, বাঙ্গালী/ বাঙালী, ভাঙ্গন/ ভাঙন— উভয় প্রকার বানানই চলবে। রঙ সঙ বাঙলা জাতীয় শব্দ রং সং বাংলা লেখা যাবে।

৯। মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ-ষ-স হবে (আঁশ < অংশু< আঁষ < আমিষ, মশা < মশক) ব্যতিক্রম — মিনসে< মানুষ্য, সাধ< শ্রাদ্ধ।

বিদেশি শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে s-এর জায়গায় স আর sh-এর জায়গায় শ হবে (ক্লাস জিনিস পেনসিল সাদা খুশি পোশাক শখ শহর শার্ট)। কিন্তু Christ হবে খ্রীষ্ট।

উচ্চারনের কারণে এইসব বানানে ছ হবে— কেচ্ছা পছন্দ তছনছ।

১০। সাধু ও চলতি প্রযোগে কৃদন্ত রূপে করান/করানো পাঠন/ পাঠানো বদলে -লুম বা - লেম লেখা যেতে পারে।

১১। 'পিছন ভিতর উপর' এধরনের শব্দে মৌখিক রূপ ' পেছন ভেতর ওপর' লেখায় গ্রহণীয় নয়। তবে 'সুতা মিছা' জাতীয় শব্দের মৌখিক রূপ 'সুতো মিছে' লেখা বিধেয়।

১২। মূল শব্দে বক্র অ থাকলে বাংলায় আদিতে অ্যা আর মধ্যে য-ফলা আ-কার বিধেয় (অ্যাসিড হ্যাট)।

১৩। বিদেশি শব্দে st থাকলে সেখানে স্ট বিধেয় (স্টোভ)।

বানান সমিতি এই আশা পোষণ করেছিলেন যে, 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদিতে নিয়মাবলী সম্মত বানান গৃহীত হইলে ক্রমে ক্রমে তাহা সুপ্রচলিত হইবে।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা অত্যন্ত কালোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। অবশ্য তার থেকে যেরকম সুফল পাওয়ার কথা ছিল তা কিন্তু অর্জিত হতে পারল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম নিয়ে বাদানুবাদ হয়েছিল প্রচুর। ব্যক্তিগত আক্রমণও কম হয়নি। দেবপ্রসাদ ঘোষ আর রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপের কাহিনি অনেকেরই জানা আছে। স্থিতাবস্থা ক্ষুণ্ণ হয়েছে—এই অভিযোগটাই বড়ো করে উঠেছিল। আবার কেউ কেউ নতুন উদ্যোগকে স্বাগতও জানিয়েছিলেন। বানান সমিতির ঘোষিত সংকল্প ছিল: 'অসংখ্য সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া আছে এবং প্রয়োজন মত এইরূপ আরও শব্দ গৃহীত হইতে পারে। এর সকল শব্দের বানান সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধানাদির শাসনে সুনির্দিষ্ট হইয়াছে। সেজন্য তাহাতে হস্তক্ষেপ অবিধেয়।' রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জনীয় এই নিয়মের উদাহরণ 'কার্তিক' শব্দের উল্লেখ ছিল। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ বানান সমিতির সভাপতি রাজশেখর বসুকে সংকোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কার্ত্তিক' শব্দ যখন কৃত্তিকা শব্দজাত তখন 'কার্তিক' বানান কি যুক্তিসংগদ? এর প্রতিক্রিয়ার সংবাদ মণীন্দ্রবাবুর লেখা থেকেই দেওয়া যাক— 'রাজশেখর বাবু কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করেই বললেন, ''মশাই, সংস্কারই করলাম একটা। আপনারা ইস্কুলমাস্টাররা কিছুই করতে দেবেন না! 'কার্তিক' শব্দ সংস্কৃত অভিধানে আছে। ছেলেরা 'কার্ত্তিক' লিখলে কেটে দেবেন, শূন্য দেবেন, 'কার্তিক'ই একমাত্র বানান।'' বানান সমিতির সভাপতির এই দৃঢ় মনোভাব কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবলম্বন করতে পারেননি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার নির্ধারিত বানান অনুসারে একটি শব্দতালিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন বলে জানালেও সেরকম কোনো শব্দতালিকা প্রকাশিত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বইপত্রে নিয়মাবলি সম্মত বানান ব্যবহারের সংকল্পটিও ঠিকমতো পালিত হয়নি। বাংলা অভিধানগুলির পরিশিষ্টেএই নিয়মাবলির জায়গা হল। কিন্তু ওইসব নিয়ম প্রয়োগ কোনো সংগঠিত উদ্যোগের তেমন পরিচয় পাওয়া গেল না।

তবে বিশ্বভারতীর প্রকাশনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশগুলি মোটামুটি মেনে চলার চেষ্টা হত। বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে বিকল্প বিধান দিয়েছিলেন সেখানে বিশ্বভারতীতে অবিকল্পভাবেই হ্রস্ব ই-কার হ্রস্ব উ-কার যুক্ত বানান ব্যবহৃত হতে লাগল। এমনকি অতৎসম স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক শব্দ দীর্ঘ ঈ -কারের নিয়ম না মেনে হ্রস ই-কার (ধোপানি বাঙালি) দিয়ে লেখা হতে লাগল।

ইতিমধ্যে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলা মুদ্রণে লাইনো টাইপ এসে গেল। ফলে বাংলা যুক্তাক্ষর স্বচ্ছরূপ পেল। জ্ঞ আর ক্ষ -এর মতো কয়েকটি সংযুক্ত ব্যঞ্জন ছাড়া আর প্রায় সব অর্ধস্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ যুক্তাক্ষরের চেহারা সহজসরল হতে পারল। যেমন ক্ + ত= ক্ত , ক্ + র =ক্র, ঙ্ + গ = ঙ্গ, গ্ + ধ = গ্ধ...। আবার উ-কার ঊ-কার ঋ-কার এগুলিরও একটি মাত্র রূপ প্রচলিত হল। শ্ উ, র্ উ, র্

+ ঊ, হ্ + ঋ এগুলির চেহারা হল শু রু রূ হৃ। এভাবে লেখাও সহজ, পড়তেও খুব সুবিধা। আনন্দবাজার এই স্বচ্ছ হরফ প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়। কিন্তু পরে পি টি এস -এর যুগে আনন্দবাজারে আবার পুরোনো প্রথা ফিরে এসেছে।

আনন্দবাজার বানানের ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন গ্রহণ করেছিল। মখ্যুত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুসরণ করলেও বিকল্পহীন সহজ বানানই ছিল আনন্দবাজারের লক্ষ্য। তাই অতৎসম শব্দে হ্রস ই-কার হ্রস্ব উ-কার ওয়ালা বানানই লেখা হতে থাকল। ওই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা দিনের পর দিন এ ধরনের বানান দেখতে দেখতে বাঙালি পাঠকের চোখ আধুনিক বানানে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ একটি ব্যবহারবিধিও প্রকাশ করেন। এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'বাংলা বানান—কী লিখবেন কেন লিখবেন' অনেকের কাছে দিশারি হিসাবে কাজ করে।

আবার ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর একবার বানান সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়। কিম্বা তখনকার প্রস্তাব এতই উৎকেন্দ্রিক ছিল যে তা বিদ্যাজীবীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ও আর এগোতে চাননি।

এরপর ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রতিষ্ঠার পর বানান সংস্কারের প্রয়াস নতুন করে শুরু হয়। আকাদেমির এই প্রচেষ্টাকে নাম দেওয়া হয় 'বানানের সমতাবিধান'। অর্থাৎ একই শব্দের জন্য অভিন্ন বানান ঠিক করার দিকেই বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়। একই সঙ্গে নজর দেওয়া হয় হরফের স্বচ্ছতা বিদানে। তাই এই বানানবিধির প্রথম অংশ হল লিপি বিষয়ে প্রস্তাব, আর পরের অংশ বানান বিষয়ে প্রস্তাব। ব্যাপকসংখ্যক বিদ্বজ্জন ও প্রতিষ্ঠানের মতামতের ভিত্তিতে আকাদেমি একটি সুপরিশপত্র রচনা করেন এবং পরে সেটি নিয়ে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করেন। সেই আলোচনাসভা থেকে যেসব সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বেরিয়ে আসে তা নিয়ে আকাদেমির বানানসমিতি বিচারবিশ্লেষণের পর কার্যকর সিদ্ধান্তে আসেন সেগুলি সংকলন করে বানানবিধি করা হয়। বহুসংখ্যক বিদ্বজ্জনের অভিমত গ্রহণ করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একটি বিশেষজ্ঞমন্ডলীর তৈরি করা এইসব নিয়মসূত্র আকাদেমির বানানবিধি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ -তে। ওই বিধি অনুসরণ করে আকাদেমি বানান অভিধানও প্রকাশিত হয় ১৯৯৭-এ। তারপর বানানবিধিতে দু-বার পরিমার্জন ঘটে। জুলাই ২০০৩ -এর সংস্করণটিই বানানবিধির সর্বশেষ পরিমার্জিত সংস্করণ। বানান অভিধানেরও চতুর্থ সংস্করণ বেরিয়েছে ২০০৩ -এর নভেম্বরে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্যত ১৯৯৮ -এর শেষভাগ থেকেই তাদের প্রকাশিত সব বই-এ আকাদেমির বানান অনুসরণ এবং আকাদেমির সুপারিশ -করা স্বচ্ছ হরফ ব্যবহার করে চলেছেন। সম্প্রতি মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ তাদের পুস্তকাদিতে আকাদেমির বানানবিধি আবশ্যিক করেছেন।

আকাদেমির বানানবিধির 'নিবেদন' অংশে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে : 'এই সুপারিশগুলি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির মৌলিক সৃষ্টি নয়। বহুকাল ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর বানান রীতিতে এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকার ভাবনাচিন্তায় যেসব প্রবণতা ফুটে উঠেছে সেগুলিকে প্রধানবাবে গ্রহণ করেই এই সূত্রাবলি তৈরি করা হয়েছে। ঢাকার 'বাংলা একাডেমী' গৃহীত বানানরীতির সঙ্গেও এর পার্থক্য যৎসামান্য। ...আমাদের নিয়মসূত্রে পুরোনো নিয়মের কোনো বৈপ্লবিক উচ্ছেদ বা পরিবর্তন করা হয়নি। বানান ও লিপির ক্ষেত্রে যেখানে ঐতিহাসিক কারণে একাধিক মান বা আদর্শ চালু আছে সেখানে তাদের সংখ্যা কমিয়ে একটি দাঁড় করবার চেষ্টা করা হয়েছে।' আর বানান অভিধানের 'মুখবন্ধ' -তে বলা হয়েছে— '...এই অভিধানেই একেবারে নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বানান, যথাসম্ভব কম বিকল্প নিয়ে হাজির। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে বিনীত অনুরোধ এই, বিকল্পগুলিকে ভুল ধরে নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিকল্প বানান কাটবেন না। কিন্তু তারা যাতে ওসব ক্ষেত্রে একটিমাত্র বিকল্প লিখতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে সেদিকে সস্নেহ যত্ন নেবেন।'

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গৃহীত বাংলা বানানবিধির সূত্রগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে নীচে সাজিয়ে দেওয়া হল :

১. তৎসম শব্দে যেখানে বিকল্পে ই বা উ লেখা যায় সেখানে ই/ঈ বা উ/ঊ-র মদ্যে প্রথমটিই শুধু গ্রহণীয় (আবলি কুটির থূলি ধরণি পদবি সূচি পঞ্জি শ্রেণি যুবতি উষা উষসী)।

২. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হবে না (অর্জন আর্য উর্ধ মূর্ছনা)।

৩. তৎসম সব্দে যেখানে শ-ষ-স তিনটি বা দু-টি স্বীকৃত সেখানে শুধু তালব্য শ বসবে (কোশ কিশলয় কলস কুশীদ মুশল শায়ক শরণি)।

৪. যেসব তৎসম সব্দে ঙ-র জায়গায় বিকল্পে অনুস্বার লেখা যায় সেখানে অনুস্বারই লিখতে হবে (অলংকার সংগীত সংঘ) আঙিনা ক্যাঙারু ডাঙা নোঙরা ভাঙা রঙিন লাঙল এ ধরনের অতৎসম শব্দ ঙ্গ না দিয়ে শুধু ঙ দিয়েই লিখেতে হবে।

৫. যেসব তৎসম শব্দের শেযে বিসর্গ আছে সেগুলি বর্জন করা হবে (অন্তত বস্তুত প্রদান প্রয়াস ক্রমশ অহরহ পুনঃপুন)। আবার দুঃস্থ/স্থ, নিঃশ্বাস/নিশ্বাস বক্ষঃস্থল/বক্ষস্থল মনঃস্থ/মনস্থ এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলি বিসর্গ ছাড়াও শুদ্ধ, সেখানে দ্বিতীয় বিকল্পটিই গ্রহণীয়।

৬. তৎসম শব্দের পদান্তের হস্‌চিহ্ন বর্জিত হবে (আশিস সম্রাট শ্রীমান)। তবে সন্ধির বেলায় পূর্ব পদের শেযে হস্‌চিহ্ন থকেবে (দিগ্‌ভ্রান্ত পৃথক্‌করণ)।

অতৎসম শব্দে নিতান্ত অসুবিধা না হলে হস্‌চিহ্ন লাগানোর দরকার নেই।

৭. ইন্-ভাগান্ত শব্দে 'তা' আর 'ত্ব' প্রত্যয় যোগ করার সময় সংস্কৃত নিয়ম মানা হবে (একাকিত্ব মন্ত্রিত্ব প্রতিযোগিতা)। কিন্তু সমাসবদ্ধ পদে কিংবা অন্য প্রত্যয় যোগে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না (আগামীকাল স্থায়ীরূপ মন্ত্রীসভা গৃণীগণ)

৮. অতৎসম শব্দে ঈ ও ঊ ব্যবহার করা হবে না। অতৎসম স্ত্রীবাচক শব্দ, জীবিকা ভাষা জাতি বোঝাতেও শুধুই হ্রস্ব, ই-কার হবে। অতৎসম বিশেষণ শব্দে ই-প্রত্যয় যুক্ত হবে। তাই, ইদ ইগল, বাড়ি পাখি কাহিনি, খুড়ি গাভি গয়লানি শাশুড়ি রানি পূজারিনি, ডাক্তারি মাস্টারি জজিয়তি, ইরেজি মারাঠি হিন্দি, ফরাসি বাঙ্গালি, দেশি দরদি সরকারি— এ ধরনের সব শব্দই অবিকল্পভাবে হ্রস্ব ই-কার দিয়েই লেখা হবে। তেমনি 'বিদ্রুপ' তৎসম নয় বলে হ্রস্ব উ-কার হবে। 'পুব পুজো ধুলো' বানান লেখা হবে হ্রস্ব উ-কার দিয়ে।

৯. 'কি' আর 'কী' তফাত করতে হবে। যে প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ কিংবা না হবে। যেমন, এই বইটা কি তুমি এখন পড়ছে? (উতর হবে হ্যাঁ কিংবা না)। কিন্তু, কী বই তুমি পড়ছ? (এখানে কী বই মানে কোন্ বই)।

১০. এইসব শব্দে ও-কার দিতে হবে— ছোটো বড়ো কালো ভালো মতো এগারো বালো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো। কোন্ আরও কোনো-র সঙ্গে তপাত করতে হবে।

সাধিত ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের শেযে নো হবে (করানো দেখানো শোনানো পাঠানো কাওয়ানো)।

সাধিত প্রযোজক ধাতুর ভবিষৎ অনুজ্ঞায় ইয়ো লেকা হবে (করিয়ো দেখিয়ো শুয়িো)।

একই ভাবে 'খেয়ো দিয়ো যেয়ো'।

১১. এইসব শব্দে ঐ বা ঐ কার না লিখে অই লেখা হবে— ওই অথই বইকি বইঠা দই খই হইচউ রইরই।

এইসব শব্দে ঔ-কার না লিখে অউ লেখা হবে— বউ মউ বউনি পউষ মউজ মউলি।

১২. জর্গীয় জ-দিয়ে লেখা হবে এমন শব্দের নমুনা : জাঁতা জাঁতি জোগাড় জোগান জোয়ান।

১৩. এইসব শব্দে ক্ষ নয়, লেকা হবে খ দিয়ে— খুদে খুদে খেত খ্যাপা।

১৪. অতৎসম শব্দে শুধুই দন্ত্য ন ব্যবহৃত হবে। এধরনের শব্দের নমুনা : কাজ সোনা রানি অঘ্রান ঘরনি মানিক টাকরুন পরগনা কোনাচে কোরান ধরনা গুনতি শিহরন প্যান্ট গ্যারান্টি ডকুমেন্ট প্রেসিডেন্ট লন্টন গন্ডা গুন্ডা ঝান্ডা ঠান্ডা প্যান্ডেল বাউন্ডারি লন্ডন লন্ডভন্ড কর্নেল কডার্ন গভর্নর।

১৫. যে-ধরনের অতৎসম শব্দে আস্ত ত বসবে, খন্ড ৎ নয়, তার নমুনা — আড়ত, কুচ্ছিত অচ্ছুত তফাত কৈফিয়ত গনতকার ফেতর মারফত।

১৬. যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে হবে যে-ধরনের শব্দে—আলপনা উলটো কবজা কবজি সবজি পালকি পলটন পেতনি বকশি মুনশি রিক্‌শ হিস্‌বা মফস্‌সল।

১৭. বিদেশি শব্দের উচ্চারণে অ্যা ধ্বনি থাকতে তার বাংলা বানান অ্যা দিয়ে হবে (ওসিড অ্যাটর্নি অ্যান্ড)।

১৮. ইংরেজি শব্দে st বর্ণগুচ্ছ থাকলে বাংলায় তা স্ট দিয়ে লিখতে হবে (মাস্টার স্ট্রিট)।

১৯. বিদেশি শব্দে র্-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সাধারণভাবে র্ রেফ হয়ে পরবর্তী ব্যঞ্জনের মাথায় গিয়ে বসে। যেমন, পর্দা কার্তুজ মার্কেট সর্দার।

তবে শব্দের গোড়ায় বা শেষে বিদেশি উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগ হলে মূলের র-ই বজায় থাকবে, রেফ হয়ে যাবে না। উদাহরণ , গরমিল হরদম কারসাজি খবরদার নজরদারি।

এছাড়া, ধাতুর শেষ উপাদান র্ হলে তা পরবর্তী সংযোজনে ওই র্ রেফ হিসেবে না লিখে পূর্ণ রূপেই লিখতে হবে (ঝরনা ভরতি ধরতাই)।

২০. বিদেশি শব্দের বেলায় ঋ-কার ব্যবহার না করে র-ফলা ই-কার লিখতে হবে (খ্রিস্ট ব্রিটিশ)

আকাদেমির বানানবিধি নিবিড়ভাবে অনুধাবন করলেই সহবেই বুঝতে পারা যাবে যে, মূলস্রোতের ধারাবাহিক চিন্তাভাবনা ও বিচারবিশ্লেষণের সঙ্গে সংগতি রেখেই এর নিয়মাবলি সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে যেভাবে বানানের শৃঙ্খলা আনতে চেষ্টা করেছিলেন সেই প্রক্রিয়াকেই আনুসরণ করেছে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে যে স্বাভাবিক চাহিদা গড়ে উঠেছে তাকে মান্য করেই এসব বিধি তৈরি করা হয়েছে। বানান নিয়ে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা যতদূর সম্ভব দূর করে একরূপতা ও স্থিরতা নিয়ে আসাই আকাদেমির অভিপ্রায়। সম্প্রতি কালপর্বে একটি ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদনের তাগিদেই আকাদেমির এই সদর্থক পদক্ষেপ।

অন্য সব সংস্কার প্রক্রিয়ার মতোই বাংলা আকাদেমির এই প্রয়াস নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠেছে। বানান নিয়ে মতের বিভিন্নতা বা বিরোধ থাকতেই পারে। একটি জীবন্ত ভাষার পক্ষে তা স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রযোজন, বাংলা বানানে বিকল্প বর্জনের প্রস্তাব করে অরুণ সেন ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে একটি 'বানানের অভিধান' প্রণয়ন করেছিলেন। আনন্দবাজার ছাড়া সাহিত্য সংসদও একটি নিজস্ব ব্যবহারবিধি অনুসরণ করে থাকেন। আনন্দবাজার বা সাহিত্য সংসদের বানানবিধির সঙ্গে আকাদেমির বানানবিধির সামান্য কিছু অমিল থাকলেও বিভিন্নতা বা বিরোধের এলাকাটা খুবই সংকুচিত। এইসব প্রতিষ্ঠানের বানানবিধিগুলির মধ্যে সমতা ও সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রটাই প্রশস্ত। তাই বলা চলে, এই ধারাবাহিক সংস্কার প্রক্রিয়ার পরিণামে আজ বাংলা বানানে দ্বিধা ও বিভ্রান্তির বদলে অনেকটাই শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা এসেছে।

বাংলা আকাদেমির বানানবিধি পুস্তিকার নিবেদন অংশ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে উপসংহার টানা যেতে পারে : 'এক হিসাবে বানানের সমতাবিধানের সকল প্রস্তাবই একটি ধারাবাহিক প্রকল্পের এক অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন। এটা কিছুদিনের জন্য চূড়ান্ত, চিরকালের জন্য নয়। তবু ছাত্রছাত্রীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার স্বার্থে, সাধারণ পাঠকের বিভ্রান্তি মোচনের জন্য, হয়তো খানিকটা ভাষা - ব্যবহারকারীদের ভাষাগত অহমিকার জন্য, এই প্রয়াস করতেই হয়।'